



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 878 - 883

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্রনাট্যের রূপান্তর : ‘রাজা ও রানী’, ‘তপতী’

ড. পল্লবী চট্টোপাধ্যায়

Email ID: Chatterjeepallabi658@gmail.com

 0009-0002-9546-1805

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Rabindranath
Tagore, Bengali
drama, Raja o
Rani, Tapati,
prose drama,
poetic drama, self-
revision,
Shakespearean
influence,
character
transformation,
tragic elements.

Abstract

This paper explores the evolution of Rabindranath Tagore's dramatic vision in the later phase of his literary career, focusing on a comparative analysis of 'Raja o Rani' and 'Tapati'. The study traces Tagore's transition from poetic to prose drama and highlights his movement from the Shakespearean model toward an independent dramatic identity. While Raja o Rani reflects a lyrical, verse-based form influenced by early romantic aesthetics, Tapati represents a matured synthesis of realism, humanism, and spiritual awakening through prose dialogue. The paper examines changes in structure, dialogue, characterization, and thematic expression to demonstrate Tagore's self-critical engagement and creative refinement. Ultimately, Tapati stands as a testament to Tagore's transformation from poetic idealism to profound humanistic and spiritual realization within the framework of modern Bengali theatre.

Discussion

রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত নিজেরই সৃষ্টিকে বারবার ভেঙ্গেছেন। এক নাটকের ভাবনা থেকে গড়ে তুলেছেন অন্য নাটক, কখনো বা কবিতাকে দিয়েছেন নাট্যরূপ। কবিতা রূপ পেয়েছে গল্প, উপন্যাস, ছোটগল্প- হয়ে উঠেছে নাটক, চিঠি হয়েছে কবিতা, আবার একই নাটক একাধিকবার পরিবর্তিত হয়েছে এমন উদাহরণও আছে। নাটকের কাহিনী নির্মাণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আজীবন বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। ঐতিহাসিক কোন ঘটনা সেখানে যেমন স্থান পেয়েছে তেমন প্রথমযুগে রচিত কোন নাটক পরিমার্জন করে নবরূপও দান করেছেন, এবং সেই পরিবর্তনেও রেখেছেন স্বাভাবিকতার ছোঁয়া। প্রেমের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন, বন্ধন থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন নাটকে, এ প্রসঙ্গে Thomson বলেছেন, -

“His dramatic work is the vehicle of ideas, rather than the expression of action.”²

বিষয়ের এত বৈচিত্র্য বিশ্বের আর কোন নাট্যকারের রচনায় পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। গদ্যনাটকের হাত ধরেই রবীন্দ্রনাথ নাটকের কাহিনীর মধ্যে এত বৈচিত্র্যতা এনেছেন। আলোচনায় উল্লিখিত নাটক দুটি শুধুই রূপান্তর নয়, তা গদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটকের এক বিরলতম সার্থক পরিবর্তন বলা যায়।

আজন্ম ঠাকুরবাড়ীর বিদেশী নাট্যচর্চার আবহাওয়ায় লালিত পালিত হওয়া রবীন্দ্রনাথ, পাশ্চাত্য নাট্য ধারাকেই অনুসরণ করে প্রাথমিকভাবে নাট্যরচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৮৮৯ সালে শেক্সপীয়রের নাট্যরীতির আদর্শে পদ্যছন্দে

রচনা করলেন রাজা ও রানী। রচনার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই সময় রবীন্দ্রনাথ নাট্য রচনা পর্বে সদ্য পর্দাপণ করেছেন, ভারতী পত্রিকার লেখা শুরু হয়েছে। এর পরেই প্রকাশিত হয় মানসী কাব্য, তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে এই সময় থেকেই। এই সময়ই কবি মননে শেক্সপীয়রের নাট্যরীতির আদর্শ প্রভাব বিস্তার করে। নাটকে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির আদর্শে রচিত হয় ট্রাজিডি। রাজা ও রানী নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, -

“একদিন বড়ো আকারে দেখা দিল একটি নাটক — রাজা ও রানী। এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয় রূপে অসংগত।” (রবীন্দ্র নাট্য সংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা - ৪৬৭)

নাটকের ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করি, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ভূমিকার আত্মসমালোচনা করে লিখেছেন, ‘লিরিকের প্লাবন’, যা নাটককে আরো দুর্বল করে তুলেছে। এছাড়াও, রাজা ও রানী নাটকে আরো অনেক দুর্বলতা বা রচনার দোষ-ত্রুটি খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্র গবেষকগণ। এই আলোচনার উদ্দেশ্য সেই ত্রুটি খোঁজা নয় তাই সেই ব্যাখ্যাও আমরা করবো না। রাজা ও রানী নাটকটি এত দোষত্রুটি থাকার পরেও কেন এত গুরুত্বপূর্ণ তা দেখা যাক।

- এই নাটকে প্রথম অঙ্কদৃশ্য এবং প্রতিটি অঙ্কে দৃশ্য বিভাজন (scene) করা হয়েছে। এর আগে অন্য কোন নাটকে পাশ্চাত্যরীতির আদর্শে এই অঙ্কদৃশ্য বিভাজন লক্ষ্য করা যায় নি।
- নাটকটি রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় করলেন পদ্যছন্দ, এমন প্রহসনমূলক, সমাজব্যঙ্গমূলক নাটক যে পদ্যছন্দে রচিত হতে পারে এই নাটকটি তার সার্থক উদাহরণ বলা যায়।
- এর আগে অন্য কোন নাটকে সংলাপ রচনায় এত রসবোধের পরিচয় দেননি রবীন্দ্রনাথ, যদিও প্রথম যুগের রচনা বলে এ নাটকে এই ভাবটি লক্ষ্য করা গেছে।

এই নাটকের প্রথম নাট্য রূপান্তর ঘটে ভৈরবের বলি নাটকে। ১৮৯০ সালে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ‘রাজা ও রানী’ নাটকের একটি অভিনয়যোগ্য মঞ্চ সংস্করণ ভৈরবের বলি মঞ্চস্থ হয়, কিন্তু তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। এরপর ১৯২৯ সালে ‘রাজা ও রানী’ নাটকের অভিনয় যোগ্য নূতন রূপ ‘তপতী’ প্রকাশিত হয়। এই পরিবর্তনের সময় সংলাপ রচনায় রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় করলেন গদ্য ছন্দ। এই পরিবর্তনের কারন হিসেবে মনে করা হয়, রূপক বা প্রতীকের প্রকাশ কাব্যছন্দে ততখানি সম্ভব নয় যতখানি চলিত ভাষায় বা কথপোকথনের শব্দচয়নে সম্ভব। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ নাট্য সাহিত্যে নাটকের গদ্যরূপ বা গদ্য নাটকের প্রচলন ধীরে ধীরে শুরু করলেন। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, গদ্য বা চলিত ভাষার ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনা প্রকাশ করা অনেক বেশী সহজ এবং সর্বসাধারণের কাছে তা অধিক গ্রহণযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বরাবই তার গদ্য নাটকে তাই অন্তর্নিহিত অতীন্দ্রীয় অনুভূতির প্রকাশকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। গদ্যনাটকগুলিতে কাহিনী নির্বাচনে, চরিত্র রূপায়নে, দ্বন্দ্ব সংঘাতের চিত্র উদঘাটনে এবং সর্বপরি মঞ্চসজ্জায় নাট্যভাবনার মৌলিক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

এরপর তপতী নাটকের প্রসঙ্গে আসা যাক, এই নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, -

“রাজা ও রানী আমার অল্পবয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা। সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে - সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটাই রাজা ও রানীর মূল কথা। রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত। এই নাটকের অন্তিম কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে -- এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়। অনেকদিন ধরে রাজা ও রানীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে শ্রীমান গগনেন্দ্রনাথ যখন এই নাটকটি অভিনয়ের উদ্যোগ করেন তখন এটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে

একে অভিনয়যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম। দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছিলুম এ নাটক আগাগোড়া নতুন করে না লিখলে এর সদগতি হতে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্য মতো দায়িত্ব শোধ করেছি। পুরানো নাটককে নতুন করে যখন লেখা গেল তখন পুরাতনের মোহ কাটিয়ে তার নতুন পরিচয়কে পাকা করতে গেলে অভিনয় করে দেখানো দরকার। সেই চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এই উপলক্ষ্যে নাট্যমঞ্চের আয়োজনের কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলা আবশ্যিক।” (রবীন্দ্রনাট্য সংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা - ৪৬৭)

উপরিউক্ত মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় ‘তপতী’ অভিনয়যোগ্য নাট্যরূপান্তর এবং এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত দোষ ত্রুটিগুলি সংশোধনের একটি সং প্রচেষ্টা করেছেন। এই রূপান্তরের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য খোঁজার জন্য নাটক দুটির গঠনরীতি, সংলাপ, ট্রাজিক পরিবর্তন, চরিত্রচিত্রায়ন, সংগীত ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

গঠনরীতি : ‘রাজা ও রানী’ নাটকে প্রথম পাশ্চাত্যরীতির অনুকরণে অঙ্কদৃশ্য বিভাজন করেছিলেন নাট্যকার। তপতী নাটকে সেই পথ থেকে সরে এলেন রবীন্দ্রনাথ। শেক্সপীয়রের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য, নাটকের কাব্যগুণ। কাব্য ছাড়া শেক্সপীয়রের নাটক অকল্পনীয়। রবীন্দ্রনাথও এক্ষেত্রে সেই আদর্শকে অনুসরণ করেছিলেন। নাটকের মধ্যকার ভাবকে প্রতিষ্ঠা করতে কাব্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ‘তপতী’ নাটককে চারটি দৃশ্যে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম দৃশ্য ভৈরব মন্দিরের প্রাঙ্গণ, দ্বিতীয় দৃশ্যে রানী সুমিত্রা ও প্রতিহারীর প্রবেশ, তৃতীয় দৃশ্যে কাশ্মীর রাজ্য দেখানো হয়েছে। চতুর্থ দৃশ্য ধ্রুবতীর্থ এবং মার্তণ্ডদেবীর মন্দিরে। অ্যারিস্টোটল নাটকের যে ত্রয়ী ঐক্যের কথা বলেছেন ‘তপতী’ নাটকে সেই ভাব রক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ নাটকে কালগত পটভূমিকার কোন নির্দেশ লক্ষ্য করা যায় না, সূত্রাং ধরে নেওয়া যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে কোন প্রত্যক্ষ বিবরণের মধ্যে না গিয়ে দর্শককে সরাসরি নাটকের মধ্যে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। রাজা ও রানী নাটক রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপিয়রের ট্রাজেডির আদর্শকে অনুসরণ করার ফলে নাটকের শেষে দেখা যায় মৃত্যুর মিছিল এবং নায়কের আত্মশুদ্ধির পথে যাত্রা করার কোন আভাস পাওয়া যায় না। ফলে নাটকটি দর্শকের মনে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি পরবর্তীতে তপতী নাটক রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপিয়রের ট্রাজেডির আদর্শ থেকে সরে এসে তার মধ্যে নিজস্বতার ছোঁয়া রাখলেন এবং নাটকের শেষে ভৈরবের পায়ে রাণী সুমিত্রার আত্মসমর্পণ এবং তপতী রূপে আত্মপ্রকাশ দর্শকের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। এছাড়া রাজা ও রানী নাটকের শেষে লক্ষ্য করা যায় রানী সুমিত্রা সোনার থালায় ভাই কুমার সেনের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে রাজসভায় প্রবেশ করেন এবং তার পতন ও মৃত্যু হয়। সুমিত্রার এই রূপ দেখে ইলাও মুর্ছিত হয়। সুমিত্রা বললেন, -

‘পূর্ণ তব
মনস্কাম, এবে শান্তি হোক, শান্তি হোক
এ জগতে, নিবে যাক নরকাগ্নিরাশি,
সুখী হও তুমি। (উর্ধ্বস্বরে) মাগো জগৎজননী,
দয়াময়ী, স্থান দাও কোলে’।
(রবীন্দ্র নাট্য সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫০)

মৃত্যুর এই মিছিল নাটকে অপ্রাসঙ্গিক তা রচনার দোষ দুষ্ট। এই মৃত্যুর ঘনঘটাকে বর্জন করে নিজের জীবন দৃষ্টি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তপতী নাটকের পরিণতি রচনা করেছিলেন। তপতী নাটকের সমাপ্তি হয় মিলন, বিষাদ, দুঃখ এসব কিছুর উর্ধ্বে এক আধ্যাত্ম চেতনায়। সুমিত্রার আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে আমার অগ্নিশয্যা অনেক দিন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে, তুমি দেখেছ বহুদুঃখের সেই আয়োজন। আজ সময় হয়েছে, আনন্দ করো, জ্বলুক শিখা, বিলম্ব করো না। (রবীন্দ্র নাট্য সংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা - ৫১৫)

যেখানে মানবিক আবেদন, প্রেম ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সুমিত্রা দেখা দেন সাধিকা, তপস্বিনী রূপে। রাজা ও রানী নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তপতী নাটকে সেই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হল সুমিত্রার মধ্য দিয়ে। ‘রাজা ও রানী’ নাটকে রবীন্দ্রনাথ রাজা ও রানী সুমিত্রার মধ্যে একটি বিরোধের প্রসঙ্গ এনেছেন। কিন্তু সেই বিরোধ কেন

হয়েছে তার কোন স্পষ্ট কারণ নাটকে লক্ষ্য করা যায় না। ‘তপতী’ নাটকে এই বিরোধের কারণ স্পষ্ট করেন - রাজা বিক্রমদেব রানী সুমিত্রাকে পাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করেন এর পরেই কর্তব্যজ্ঞানহীন রাজার সাথে প্রজাহিতৈষিণী রাজামাতার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। সুতরাং একথা বলাই যায়, তপতী নাটকের সুমিত্রা তেজস্বিনী, নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন এক নারী। তার রূপে শান্তি, প্রেম মোহমুক্তির বাণী ধ্বনিত হয়েছে। তপস্যা করে তিনি শুদ্ধ করতে চেয়েছেন দেহমন।

রুদ্রের কাছে বহুদিন পূর্বে আত্মনিবেদন করেছিলুম। ব্যাঘাত ঘটেছিল, সংসার আমাকে অশুচি করেছে। তপস্যা করেছে, আমার দেহমন শুদ্ধ হয়েছে। আজ আমার সেই অনেক দিনের সংকল্প সম্পূর্ণ হবে। তাঁর পরমতেজে আমার তেজ মিলিয়ে দেব। (রবীন্দ্র নাট্য সংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা - ৫১৫)

তুলনায় রাজা ও রানী নাটকের সুমিত্রা কিছু ক্ষেত্রে আত্ম সংযম হারিয়েছেন। এছাড়া, রাজা রানী নাটকে কুমার - ইলার চরিত্রদুটির প্রসঙ্গ নাটকে অতিমাত্রায় দীর্ঘায়িত করেছেন সে তুলনায় তপতী নাটকের নরেশ-বিপাশার প্রেম বৃত্তান্তের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। বিপাশার কাছেই নরেশ প্রথম জানতে পারে সুমিত্রা তার রাজ্যবাসীকে রক্ষা করতেই বিক্রমদেবকে বিবাহ করেন। নবরূপে লিখিত এই তপতী নাটকে অবাস্তব উপকাহিনি, চরিত্রের অধিক সংযোজন বর্জন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। নারায়ণী, দেবদত্ত রেবতী এমন বেশ কিছু চরিত্রের সংলাপ বর্জিত হয়েছে, কুমারসেনের ভূমিকাও কম লক্ষিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রও সংক্ষিপ্ত।

ট্রাজিডি : তপতী নাটকে রাজা বিক্রমদেবের চরিত্রে যে ট্রাজিডি লক্ষ্য করা যায় তা শেক্সপীয়রের নাটকের আদর্শে রচিত। আমাদের দেশে প্রথম পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে নাটক রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মূলত অ্যারিস্টোটল নাটকের যে সূত্র নির্মাণ করেছিলেন, সেই ধারাকে বজায় রেখেই তিনি নাট্য রচনা করেন। পরবর্তীতে বাংলার অন্যান্য নাট্যকারেরাও এই ধারায় অবলম্বন করে অগ্রসর হতে থাকেন। অ্যারিস্টোটল প্রদত্ত নাটকের সূত্র অনুসারে ট্রাজিডির নায়ককে হতে হবে একজন অসাধারণ ব্যক্তি। দোষেগুনে সাধারণ মানুষের মতো হলেও চরিত্র চিত্রায়নে তার মধ্যে অসাধারণত্ব থাকবে। তার জীবনে দূর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে তার নিজেরই দোষে। শেক্সপীয়রের নাটকের নায়ক চরিত্রগুলি এই ধারারই ছিল। তাঁর নাটকে নায়ক চরিত্রের পরিণামই ছিল নাটকের প্রধান দর্শনীয় বিষয়। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে এই আদর্শই গ্রহণ করলেন। রাজা বিক্রমদেব কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করে রানী সুমিত্রাকে বিবাহ করে নিজের রাজ্যে নিয়ে আসেন, এসময় থেকেই তিনি অনৈতিকতার সূচনা করেন। বিবাহের পর থেকেই রাজকার্য সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েন রাজা, রাজ্যে দেখা দেয় দুরাবস্থা, প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, রাজ্যের নারীদের প্রতি চলে নির্মম অত্যাচার এভাবেই নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে নাটকে ট্রাজেডির উদ্ভব হয়।

শান্তিকুমার দাসগুপ্ত তাঁর ‘রবীন্দ্র নাট্য পরিচয়’ গ্রন্থে লিখেছেন, - “এরিস্টোটল প্রদত্ত ট্রাজেডির সংজ্ঞা অনুবাদ করিয়া বুচার বলিয়াছেন, -

“Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude ... through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions.”^২

‘তপতী’ নাটকে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের ট্রাজেডির ধারা থেকে সরে এসে, সম্পূর্ণ এক নিজস্ব ধারা তৈরী করলেন। পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী ট্রাজেডিতে নায়কের কোন না কোন ত্রুটি থাকবেই, যা কেন্দ্র করে তার জীবনে ট্রাজিডি নেমে আসে। শেক্সপীয়রের নাটকে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, দম্ভ মানুষের ষড় রিপুকে কেন্দ্র করেই নায়কের জীবনে ত্রুটির উদ্ভব হয়। এই নাটকেও রাজা বিক্রমদেবের রানী সুমিত্রার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তিই তার জীবনের এই শোচনীয় পরাজয় ডেকে আনে। রাজার রাজকর্তব্য পালনে অক্ষমতার ফলে রাজ্য জুড়ে নেমে আসে বিশৃঙ্খলা, রানী বিদ্রোহ দমন করতে সচেষ্ট হলে রাজা তা সমর্থন করতে পারলেন না, তার মধ্যে জেগে উঠলো প্রতিশোধ স্পৃহা। যার ফলে সকলের জীবনেই দেখা দেয় দুঃখ, বেদনা, নেমে আসে অন্ধকার। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের রীতির কিছুটা অনুকরণ করেছেন। তবে নাটকের পরিণতি পাশ্চাত্য ধারার ট্রাজিক নাটকের মতো করুণরসাত্মক হয়নি। রানী সুমিত্রা আত্মশুদ্ধির পথে এগিয়ে গেলেন। তপস্যায় সিদ্ধ সুমিত্রা হয়ে উঠলেন তপতী। নাটকের সমাপ্তি হল মৃত্যু মিছিলের মধ্য দিয়ে নয়। নব জীবনের জয়গানের মধ্য দিয়ে,

আধ্যাত্মচেতনায় উত্তরণের মধ্য দিয়ে। তবে রবীন্দ্র সমালোচকদের মতে তপতী নাটকে নাটকীয়তা কম, মানবিক গুন হ্রাস পেয়ে তত্ত্ব প্রধান্য পেয়েছে।

সংলাপ : ‘রাজা ও রানী’ নাটকে যে ‘লিরিকের প্লাবন’, নাটককে দুর্বল করেছিল, সেই ত্রুটিকে দূর করার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ‘তপতী’ নাটকে। ‘রাজা ও রানী’ রচনা করেছিলেন পদ্যে, ‘তপতী’ রচিত হলে গদ্য সংলাপে। নাট্য রচনার প্রথম দিকে পদ্য সংলাপ এর ব্যবহার করলেও পরিণত বয়েসে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, -

“গদ্য সংলাপের একটা জোরালো দিক আছে। তার মতে, - গদ্যটা স্থূলদৃশ্য; তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়।”^৩

রবীন্দ্র গবেষক অশ্বকুমার সিকদারের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য, -

“তপতী নাটক গদ্যে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও তার সংলাপের মধ্যে সেই নাটকীয়তার টান নেই।”^৪

‘তপতী’ নাটকে বিক্রমদেব ও সুমিত্রার সংলাপের বেশ কিছু অংশ দর্শকের মনে এক গভীর আবেগ সৃষ্টি করে, ফলে নাটকটি অন্য মাত্রা পায়। বিশেষত নাটকের শেষ দৃশ্যে যখন রানীর প্রতি ভালোবাসা ভরা অনুযোগে বিক্রমদেব বলে ওঠে,-

‘...আমার রাজকোষ তোমার পায়ের তলায় সম্পূর্ণ ফেলে দিচ্ছি - তুমি প্রজাদের দান করতে চাও, করো দান যত খুশি। তোমার দাক্ষিণ্যের প্লাবন বয়ে যাক এ রাজ্যে’। (রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা - ৪৭৬)

সুমিত্রা সংলাপের মধ্যে সর্বদা কর্তব্যবোধের পরিচয় মেলে। তিনি যখন রাজাকে বলেন, -
‘মহারাজ, ধর্ম সাক্ষী করে আমি কি তোমার সহধর্মিণী হইনি। রাজ্যের পাপ যে মুহূর্তে তোমাকে স্পর্শ করে সেই মুহূর্তেই কি আমাকেও স্পর্শ করে না’। (রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা - ৪৮৯)

এই সংলাপের মধ্যে রাজ্যের রানী হিসেবে তাঁর দায়িত্ববোধ, নিষ্ঠার পরিচয় মেলে। রাজাকে সর্বদা ন্যায় ও সত্যের শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। প্রজাদের প্রতি রাজ কর্তব্যকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনে রাজ মাতার মতো তিনি তাদের পাশে থেকেছেন যা প্রশংসনীয়। বিপাশা, নরেশ, ত্রিবেদী এদের সংলাপও নাটকে অন্য মাত্রা যোগ করেছে। সুতরাং একথা বলা যেতেই পারে, পূর্ববর্তী নাটকের তুলনায় ‘তপতী’ নাটকের সংলাপ অনেক বেশী নাট্যপোষণী।

চরিত্র চিত্রায়ন : নাটকের শুরুতে দেখা যায়, রাজা বিক্রমদেব রানী সুমিত্রাকে বিবাহের পর থেকেই তার প্রতি আসক্তিতে রাজকার্য প্রায় ভুলতে বসেছেন। রাজ্যের প্রজাদের প্রতি তার যে কর্তব্যবোধ তা ক্রমশ লোপ পেয়েছে। রাজার তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ ভুলে কেবল নিরবিচ্ছিন্ন প্রেমরসলীলার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, ‘বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন’। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর ‘রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা’ গ্রন্থে বলেছেন -

“রাজার প্রেম কর্তব্য ছাড়িয়া, সংসার ভুলিয়া, একটিমাত্র নারীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছি ...।”^৫

আবার অন্য দিক থেকে বিচার করলে দেখা যেতে পারে, রানী সুমিত্রার প্রতি রাজা যে কর্তব্যবোধে অটল তা শুধুমাত্র স্বামীর কর্তব্য পালন নয়। এ কর্তব্যবোধ তার ভালোবাসারও প্রকাশ। রানীর প্রতি প্রেমই তার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ‘রাজা ও রানী’র সমগ্র নাটক জুড়ে বিক্রমদেবের যে সাহিত্যজ্ঞান বা রসবোধের পরিচয় মেলে তা যেন কিছুটা ভাটা পড়ে ‘তপতী’ নাটকে। রানী সুমিত্রা ও দেবদত্তের কথপোকথনের ভাব, ভাষা, বাচনভঙ্গী, কল্পনাবোধ, অলঙ্করণ, শব্দচয়নের প্রয়োগ - প্রমাণ করে তার সাহিত্যজ্ঞান, মীনকেতুকে অর্ঘ্যদানের সময় তিনি যে মন্ত্রচ্চারোণ করেন তা থেকে তার রসবোধ ও কবিত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত পদ্যছন্দের ব্যবহারের ফলে রাজা ও রানী নাটকে সংলাপের যে সৌন্দর্য বা মাধুর্য ধরা পড়ে তা তপতী নাটকে পাওয়া যায় নি। বরং এই নাটকের বিক্রমদেব অনেক বেশী বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়েছেন। দুটি নাটকের তার মধ্যে রাজাসুলভ ব্যক্তিত্বের অভাব দেখা যায়। এ ছাড়া ‘তপতী’তে কুমার ইলার প্রসঙ্গ বাদ যাওয়ার ফলে নাটকের গতিময়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও নরেশ ও বিপাশার চরিত্রের অবতরণা করে চরিত্রের ভিঁড়ি কমাতে পারেননি তপতী নাটকেও।

তপতীর সুমিত্রা অনেক বেশী তেজস্বিনী। কুমারসেন চরিত্রটিকে রাজা বিক্রমদেবের বিপরীতধর্মী স্বভাবের গড়তে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যা সফলতা পেয়েছে ‘তপতী’তে।

সংগীতের ব্যবহার : ‘রাজা ও রানী’ নাটকে গানের সংখ্যা সাতটি, তপতী নাটকে দশটি গান আছে। তবে লক্ষ্য করার বিষয়, দুটি নাটকেই গানের উপস্থিতিতে লিরিকের প্লাবন। রাজা ও রানী নাটকের কোন গান রবীন্দ্রনাথ তপতী নাটকে গ্রহণ করেননি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে এই নাটটি রবীন্দ্রনাথ শুধু রূপান্তরই করেননি সম্পূর্ণরূপে এক নতুন রূপ দান করেছেন। কিছু পূর্বে রচিত গানও ‘তপতী’ নাটকে স্থান পেয়েছে। গানের দিক থেকে দুটি নাটকই স্বয়ং সম্পূর্ণ একথা বলাই যায়।

পরিশেষে বলা যায়, ‘রাজা ও রানী’ নাটককে রবীন্দ্রনাথ ‘লিরিকের জলাভূমি’ বলেছেন। নাটকের এই মস্তুর গতিতে কিছুটা বেগের সঞ্চয় করেছে নাটকের গানগুলি। এ পর্যন্ত আলোচনায় লক্ষ্য করা গেল রবীন্দ্রনাথের এই যে নাটকের নবরূপান্তর ঘটেছে তা রচনার পেছনে তার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে উপলব্ধি ও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি কাজ করেছে তা বলাই বাহুল্য। আত্ম সচেতন কবি নিজেই নিজের সমালোচনা করেছেন, রচনার দোষ ত্রুটি খুঁজে বার করেছেন নিজেই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভা যেমন বাল্যকাল থেকে নানা স্তর অতিক্রম করে পরিণতি লাভ করেছে তেমনি তার নাট্য রচনা ও ক্রমশ উন্নততর হয়েছে। প্রথম যুগের রচনাগুলি অল্প বয়সের আবেগ থেকে রচিত হয়েছে ক্রমশ তার জীবনবোধ পরিণত হয়েছে, যার সার্থক প্রকাশ দেখা গেছে তা নাটকগুলিতে।

Reference:

1. Thompson Edward : Rabindranath Tagore - Poet and Dramatist, (India : Riddhi, 1948) P. 48
2. দাসগুপ্ত, শান্তিকুমার, ‘রবীন্দ্র নাট্য পরিচয়’, (কলকাতা : বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৩), পৃ. ৪০
3. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পথে ও পথের প্রান্তে (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫১) পৃ. ৮৬
4. শিকদার, অশ্রুকুমার, রবীন্দ্র নাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য (কলকাতা : প্রেমময় মজুমদার, ১৩৪৪), পৃ. ৮৮
5. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা (কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৬১), পৃ. ১১১